

মহাত্মা গান্ধী : এক নির্ভীক যোদ্ধা

নেলসন ম্যাডেলা

অনুবাদ : ফেরদৌস আরেফিন

(২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুদিত)

মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতবর্ষে আর শিক্ষা নিয়েছিলেন বহুদূরের দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায়। দুটো দেশের নাগরিকত্বই তাঁর ছিল। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক প্রতিভার বিকাশে এ দুটি দেশেরই যেমন ব্যাপক প্রভাব, তেমনি উভয় দেশকেই ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে স্বাধীন করার পেছনে গান্ধীর অবদান অবিস্মরণীয়।

আদর্শগতভাবেই মহাত্মা ছিলেন উপনিবেশবিরোধী বিপ্লবের ধারক-বাহক। কিন্তু তাঁর আন্দোলনের ধরনগুলো ছিল একেবারেই ভিন্ন রকমের। অসহযোগ ছিল তাঁর প্রধান কৌশল। তিনি বিশ্বাস করতেন, শোষকের সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে শোষিতই হতে হয়। বিশেষ করে গান্ধীর হানাহানিমুক্ত ‘অহিংস আন্দোলন’ বিষয়টি বিংশ শতাব্দীর সবগুলো উপনিবেশবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনগুলোর মাঝে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। বিশ্বের অন্য আন্দোলনগুলোতে এর বিশাল প্রভাব থেকেই তা লক্ষ্য করা যায়।

গান্ধী এবং আমি আমরা দুজনই ঔপনিবেশিক অত্যাচার-নিপীড়নের শিকার এবং আমরা দুজনই আমাদের পুরো জাতিকে স্বাধীনতা হরণকারী সরকারের বিরুদ্ধে পথে নামতে উদ্বুদ্ধ করেছিলাম। আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ষাটের দশকের শুরুতে। কারণ ওই সময়েই আমাদের ওপর সবচেয়ে হিংস্র অত্যাচারগুলো নেমে এসেছিল, আমরা ক্রমশই হয়ে পড়ছিলাম শক্তিহীন, দুর্বল। ‘অহিংস আন্দোলন’ হয়ে উঠেছিল ‘দক্ষিণ আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস’-এর মূলমন্ত্র।

গান্ধী অহিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন। আমিও চেষ্টা করেছিলাম তাঁর এই ধারা যতদূর পর্যন্ত সম্ভব অনুসরণ করতে। কিন্তু একটা সময় শত্রুর অত্যাচারে আমাদের পিঠ একরকম দেয়ালেই ঠেকে গেল, আমরা অহিংসার নীতি থেকে সরে আসতে বাধ্য হলো। আমরা গঠন করলাম ‘উনখন্তো উই সিজুই’ (আফ্রিকান ভাষায় যার অর্থ ‘জাতীয় অস্ত্র’), যা আমাদের পুরো আন্দোলনকে একটি সামরিক চেহারা দিল। এমনকি তখন আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্তর্ঘাতের পথও বেছে নিয়েছিলাম, কেননা তাতে খুব একটা প্রাণহানি না হলেও শত্রুপক্ষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলো

এলোমেলো করে দেওয়া যেত সহজেই। ১৯৬২ সালে এ সামরিক যুদ্ধ ‘অর্গানাইজেশন আব আফ্রিকান ইউনিটি’ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পেল। সে সময় আমি বলেছিলাম, ‘যেসব বুর্জুয়া শোষকের কানে মানুষের হাহাকার ঢোকে না, তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনই একমাত্র পথ। আর বিশ্বের এমন একটি দেশও নেই যেটি রক্তপাত ছাড়া স্বাধীনতা পেয়েছে।’

মহাত্মা গান্ধী যে পুরোপুরি রক্তপাতের পরিপন্থী ছিলেন তাও কিন্তু নয়। বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে তিনিও অস্ত্রের ব্যবহারের সপক্ষে ছিলেন। তিনি বলতেন, ‘কাপুরুষ হয়ে ফিরে এসো না, বরং লড়তে শেখো। অসৎ কর্মের সাক্ষী না হয়ে সততার জন্য অস্ত্র ধরাটাই আমার কাছে শ্রেয়।’ আর আমি মনে করি, অহিংসা নাকি রক্তপাত— আন্দোলন কোন পথে যাবে তা সময়ই ঠিক করে দেয়।

গান্ধী কোনো সাধারণ নেতা ছিলেন না। কারো কারো ধারণা ছিল যে, তিনি ঐশ্বরিক কোনো শক্তি ধারণ করতেন। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে ভয়াবহ পারমাণবিক বোমা আঘাত হানার পরও অহিংসার বাণী প্রচারের সাহস করেছিলেন তিনি। যখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর পুঁজিবাদ সবকিছুকে গ্রাস করে ফেলেছিল, তখনও তিনি তাঁর নিজের নীতিতে অটুট ছিলেন। তিনি সবসময় দলীয় বা সমষ্টিগত মতকে ব্যক্তিগত মতের উর্ধ্বে রাখতেন, কিন্তু কারো ব্যক্তিগত মতামতকে তাচ্ছিল্য বা অবমূল্যায়ন করতেন না। গান্ধী ছিলেন একই সঙ্গে জাতিগত এবং ব্যক্তিগত স্বাধিকারে বিশ্বাসী। তিনি চাইতেন একই সঙ্গে এবং সমান্তরালভাবে প্রতিটি মানুষের নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই পুরো সমাজের নৈতিক উন্নতি সাধিত হোক।

গান্ধীর সত্যগ্রহ দর্শনটি ছিল একই সঙ্গে সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করার দর্শন, যাকে ঈশ্বরও বলা যায়। তিনি এ সত্যকে পেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা একাকী ধ্যানের মধ্য দিয়ে নয়, বরং জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পথে নেমে তবেই। তিনি বলতেন, ‘আমি ঈশ্বরকে পেতে চাই এবং আমার তাঁকে পেতেই হবে। আর এটা আমি চাই সবাইকে সঙ্গে নিয়ে করতে। কেননা আমার ধারণা, একা কখনো ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আর যদি তা-ই হতো, তবে আমি একা একা হিমালয়ে গিয়ে বিভিন্ন পাহাড়চূড়ায় ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াতাম। কিন্তু এখনো আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরকে একা একা পাওয়া যায় না। আমাকে মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। একা আমি ঈশ্বরকে কোনোমতেই পাব না।’ সুতরাং গান্ধী একই সঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে নিয়েছেন, আবার নিজের ধর্ম-কর্মও পালন করেছেন এবং এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পুরোপুরি সেকুলার।

গান্ধীর প্রথম জাগরণ ঘটে হিলি ভূখণ্ডে, বাম্বালা বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। সেখানে তিনি একজন আবেগপ্রবণ ব্রিটিশ দেশপ্রেমিকের ভূমিকায় ছিলেন এবং তাঁর কাজ ছিল আহতদের বহনকারী স্ট্রেচার গ্রুপের নেতৃত্ব দেওয়া। কিন্তু ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক জুলু সম্প্রদায়ের ওপর অকথ্য নির্যাতন

দেখে তিনি অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং শান্তির সপক্ষে পথে নামার সিদ্ধান্ত নেন। সব কাজ ছেড়ে তিনি বিশ্বমানবতার জন্য নিজেকে উজাড় করে দেন।

ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে শুরু করেছিলেন অসহযোগ। শুরু করেন ‘স্বদেশী আন্দোলন’। সবরকম ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করার মাধ্যমে ব্রিটিশ ব্যবসাকে করে তোলেন কোণঠাসা। সমগ্র ভারতবাসীও তখন গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে ব্রিটিশ পণ্যের পরিবর্তে হাতে তৈরি ভারতীয় পোশাক ও অন্যান্য পণ্য ব্যবহার করা শুরু করে। গান্ধীর এ কৌশল আফ্রিকাসহ সারাবিশ্বের কাছেই একটি দৃষ্টান্ত। কেননা এর মাধ্যমে একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক শক্তিকে কোণঠাসা করা যায়, অন্যদিকে নিজেদের দক্ষতা বাড়িয়ে নেওয়ার পাশাপাশি অর্থনীতিকেও ভালো অবস্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আর এক্ষেত্রে গান্ধী বিশ্বাস করতেন, আজ চেষ্টা করলে কাল তার ফল পাওয়া যাবে এবং পুরো জাতি একত্রে স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশী পণ্যের ব্যবহারের মাধ্যমে একটা সময় পুরোপুরি স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারবে।

আফ্রিকা এমনকি আমেরিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে গান্ধীর প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি প্রতি ক্ষেত্রেই কালো মানুষেরা সংখ্যায় অধিক হলেও ছিল নির্যাতিত। হানাহানিতে অবিশ্বাসী গান্ধী এরকম ক্ষেত্রেও অসহযোগের মতো শান্তিপূর্ণ আন্দোলনেই আস্থা রাখতে পছন্দ করতেন, যেখানে রক্তপাতের আশ্রয় ছিল না, ছিল সাম্য, মৈত্রী আর সুবিচারের মাধ্যমে নিজেদের এগিয়ে নেওয়ার আন্দোলন।

মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাসের সঙ্গে প্রচার করতেন যে একমাত্র কঠোর পরিশ্রমই অর্থনৈতিক মুক্তি আর সাফল্য এনে দিতে পারে। গান্ধী আরো বিশ্বাস করতেন, যিনি পরিশ্রম করবেন, প্রাপ্যটা তারই বেশি হওয়া উচিত। সে সময় তাঁর ‘কৃষক পাবে বেশি, জমিদার পাবে কম’- এ বাণী পুরো ভারতবর্ষের কৃষকদের চোখ খুলেই দিয়েছিল বলা যায়। সম্পদের সুষম বন্টনের নীতিতে বিশ্বাসী গান্ধী নিজে সুখী জীবন পরিত্যাগ করে সাধারণ মানুষের কাতারে নেমে এসেছিলেন। তিনি বলতেন, ‘আমরা নিজেরাই যদি দরিদ্র মানুষের কাতারে নেমে না আসি, তাহলে অর্থনৈতিক সাম্য আসবে কী করে?’ গান্ধী রাষ্ট্রের অর্থনীতির আরেকটি নতুন পরিচ্ছন্ন ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেখানে সবাইকে সমান পরিশ্রম করতে হবে এবং রাষ্ট্রে কারো কোনো ব্যক্তিগত পুঁজি থাকবে না। থাকলেও সেটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যবসায়িক খাতে লাগিয়ে দেওয়া হবে। মূলত গান্ধীর অর্থনৈতিক চিন্তাধারাটি ছিল সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির মাঝামাঝি একটি অবস্থান, যেখানেও অহিংসার পরিচ্ছন্ন ছাপ চোখে পড়ে।

গান্ধীর ধর্ম ছিল সত্যগ্রহ, যেখানে কাউকে ধ্বংস না করে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনাটাই ছিল লক্ষ্য এবং সেখানে শত্রুপক্ষ সত্য হলে তাকেও গ্রহণ করার ডাক দেওয়া হয়েছিল। আমরা হয়তো

সরাসরি গান্ধীর এ নীতিকে অনুসরণ না করেই দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্রের এমনটাই একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যেখানে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সত্যগ্রহের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।